ভাষা আন্দোলনের সুচনা লগ্ন এবং একুশের প্রথম সঙ্কলন

- অজয় রায় *

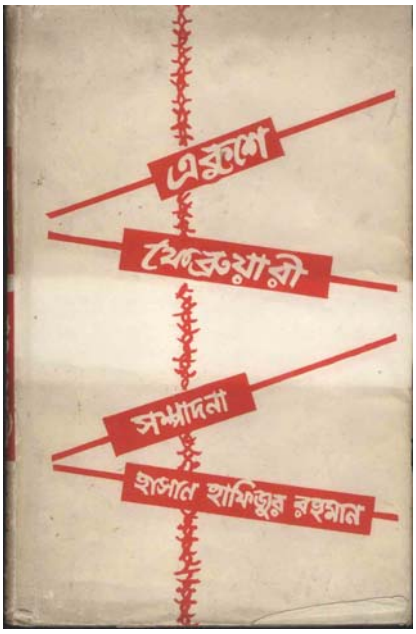

বাহান্নর ফেব্রুয়ারীতে ছাত্র-জনতা প্রাণ দিল পুর্বপাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের পুলিশের গুলিতে- বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার দাবীতে। সমকালীন ইতিহাসে এটি একটি অনন্য ঘটনা। এর পরের বছরই এই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করে ২১'শের প্রথম স্মরণিকা প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের মার্চমাসে 'একুশে ফেব্রুয়ারী' শিরোনামে। সম্স্লাদনা করেছিলেন তখনকার তরুণ সাহিত্যিক কবি হাসান হাফিজুর রহমান। কিন্তু সেই সঙ্কলন নিয়ে দু'চার কথা, যেটি এই ছোট্ট প্রবন্ধটির মুল বিষয়, বলার অগে এর পটভুমি সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা যাক।

ভাষা আন্দোলনের সুচনা ও বুদ্ধিজীবীদের ভুমিকা

বাঙালী মুসলমান ও হিন্দুর মাতৃভাষা বাংলা। আজকের তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের আগ্রাসনের যুগে তো তরুণ প্রজন্ম বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন তুলতেই পারেন- এ আবার কোন ধরণের কথা। বাঙালীর ভাষা বাংলা হবে না তো 'আফ্রিকানা' বা 'সোহেলী' হবে ? কিন্তু সমস্যা হয়েছিল শুধু ১৯৫২'তে নয়, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকেও ছিল- উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ আমলে আরও প্রকট হয়ে সমস্যা তৈরী করা হয়েছিল বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা 'বাংলা' না আর কিছু ? সাতচল্লিশপুর্ব 'পাকিস্তান আন্দোলন' কালে বাংলাভাষী সাধারণ মুসলমানদের শেখান হচ্ছিল যে তারা জন্মের পর থেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে যে ভাষায় কথা বলছে সেটি নাকি তার ভাষা নয়। তার ভাষা নাকি উর্দু ! তারও আগে যখন ইংরেজ শাসকদের উদ্যোগে এদেশে আধুনিক শিক্ষা চালু করা হচ্ছিল, তখন

* বিজ্ঞানী, প্রবন্ধকার। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের কর্মী, সে কালের 'ছাত্র ইউনিয়ন' ও 'সংস্কৃতি সংসদের সক্রিয় কর্মী।

সেদিনের মুসলিম অভিজাত নেতৃবৃন্দ ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে ঐতিহ্যিক ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা রাখার পক্ষে দাবী করেছিলেন যারই পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন স্থাপিত হয়েছিল আধুনিক 'আলিয়া মাদ্রাসা'। অন্যদিকে হিন্দু সমাজ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আবাহন জানিয়ে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে আধুনিক বাংলাভাষার সাধুরূপ জন্মলাভ করল। অষ্টাদশ শতকের পুঁথির ভাষা সাহিত্যের আসর থেকে বিদায় নিল ইতিহাসের প্রয়োজনে। পুথিঁর ভাষার কলাকৌশল দিয়ে আর যাই হোক আধুনিক কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান চর্চা করা যায় না, এ সত্যটি উপলব্ধি করতে বাংলার মুসলমানদের দীর্ঘ দিন লেগেছিল। বিদ্যাসাগর-মধুসুদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্কর-মীর মোশাররফ যদি সমৃদ্ধ সাধুভাষার রূপকার হন, তবে সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন প্রমাণ চলতিভাষাকে জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যের বাহনে পরিণত করার পথিকৃৎ- যা পরে শৈল্পিক রূপ পায় কল্লোল যুগে ও রবীন্দ্রত্তোর যুগের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের লেখকদের কলমে- যাদের কাতারে ছিলেন বিভুতিভুষণ বন্দোপাধ্যায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, নজরুল ইসলাম, সমরেশ বোস, জসীমুদ্দিন, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্র দত্ত, কিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, আবু সাইয়িদ প্রমুখ। এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে- শওকত ওসমান, শামসুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, সৈয়দ শামসুল হক, আখতারুন্জ্জামান ইলিয়াস, রশীদ করীম, আবু ইউসুফ, আবুজাফর শামসুদ্দিন, সৈয়দ ওয়ালিউল্লা, শওকত আলী, সেলিনা হোসেন, নির্মলেন্দু গুন, মহাদেব সাহা প্রমুখ।

বর্তমান প্রজন্ম যতই শ্লোগান দিক '২১শের চেতনা' বলে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে, একুশ আমাদের ঐতিহ্য বলে, সত্যিই কি তারা তখনকার প্রেক্ষাপট আত্মস্থ করতে পারে, পারা কি সম্ভব। একটি কালের বৃত্তে অন্য একটি কালকে কি ধারণ করা যায়, চাইলেও ? বুঝতে পারে একুশের সেই ক্রন্দন ? ধারণ করতে কি সক্ষম একুশের হিংসা আর ক্রোধকে- যখন আমরা বাহান্ন'তে সেই গান গেয়ে ছিলাম ঃ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফে ব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি––
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্র□-গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি ...

... ...

ওরা এদের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন বস্ত্র শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ।।

ঐতিহ্য ও পটভুমি

বেশী দুর নয় সপ্তদশ অষ্টাদশ থেকে ইতিহাসের পর্যায়গুলোর ওপর দৃষ্টি বুলালেই ধরা পড়বে যে বাংলার তথাকথিত অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ দাবী করে আসছেন তাঁরা বাঙালী নন, বাঙ্গালিত্বে তাঁরা হিন্দুয়ানির গন্ধ পান, বাংলা তাদের মাতৃভাষা নয়। এঁরা সাধারণ প্রাকৃত বাংলাভাষী মুসলমান জনকে বাঙালী

থেকে 'বিশুদ্ধ মুসলমান' বানাতে চেয়েছে। সোচ্চারে ঘোষণা করেছে মুসলমানদের ভাষা উর্দু। বাংলা হল পৌত্তলিকদের ভাষা; এঁরা চেয়েছে বাঙালী সাধারণ মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলাকে ভুলিয়ে উর্দুভাষী বানাতে। ঢাকার নবাব পরিবারের আবদুল লতিফ ছিলেন সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি। এতদসত্তেও সেকালেই মৃদু হলেও প্রতিবাদ উঠেছিল সাধারণ মানুষের কণ্ঠ থেকে। যেমন এ সময়েরই সাধারণ বাঙালী মুসলসমাজের টিপিক্যাল প্রতিনিধি হামেদ আলীর কণ্ঠে যেন সাধারণ মুসলমান বাঙালীর প্রতিবাদই উচ্চারিত হয়েছিল ঃ

> .. .. যে দেশে আমরা সাত শত বৎসর কাল বাস করিতেছি, সে দেশকে যদি আমরা এখনও স্বদেশ জ্ঞান না করি, তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য এবং পরিতাপের বিষয় আর কী আছে ? .. .. তাঁহারা বাঙ্গালার বাঁশবন ও আম্রকাননের মধ্যস্থিত পর্ণকুটিরে নিদ্রা যাইয়া এখনও বোগদাদ, বেখারা .. .. স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার বাঙ্গালার পরিবর্তে উর্দুকে মাতৃভাষা করিবার মোহে বিভোর। দুর্বল ব্যক্তিরা যেমন অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন করে, অধঃপতিত জাতিও তেমনি অস্বাভাবিক খেয়াল আঁটিয়া থাকে।

এ যেন ছিল সপ্তদশ শতকের পুঁথি কবি আবদুল হাকিমের প্রতিবাদেরই প্রতিধ্বনি ঃ

> যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
> সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
> দেশী ভাষা বিদ্য যার মনে না জুড়ায়
> নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ ন যায়।

এরও আগে সৈয়দ সুলতান, যারা বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করতে ভয় পান, তাদের উদ্দেশ্যে বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন ঃ

> যারে যেই ভাষে প্রভু করিলা সৃজন
> সেই ভাষা হয় তার অমুল্য রতন। (ষোড়শ শতাব্দী)

এতেও কিন্তু নির্ভার ও নির্ভয় হতে পারেন নি মুসলমান পুঁথি সাহিত্যিকরা। যে হোসেন শাহের রাজত্ব কালকে আমরা বাংলার সুলতানী শাসনের স্বর্ণোজ্বল অধ্যায় বলি-- যাঁকে তৎকালের বাংলা ভাষার একজন পৃষ্ঠপোষক ভাবি- সেকালেও এবং পরবর্তীকালেও মুসলমান কবিরা বাংলা ভাষায় কাব্য চর্চা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি। সে প্রমাণ আমাদের পুঁথি সাহিত্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ ধরণের ভীত সন্ত্রস্ত এক কবি হাজী মুহম্মদ লিখেছেন ঃ

> যে কিছু করিছে মানা না করিঅ তারে
> ফারমান না মানিলে আজাব আখেরে।
> হিন্দুয়ানি লেখা তারে না পারি লিখিতে
> কিঞ্চিত কহিলুঁ কিছু লোক জ্ঞান পাইতে। (ষোড়শ শতাব্দী)

নমুনা স্বরূপ আমরা দু'এক জন প্রাচীন মুসলমান কবির উদ্ধৃতি দিই। কবি মুতালিব বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করে পাপবোধে ভুগেছিলেন :

> মুসলমান শাস্ত্র কথা বাঙ্গালা করিলুঁ
> বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিনু। (সপ্তদশ শতক)

অথবা ঐ শতকের আর এক কবি আমীর হামজা একই ধরণের পাপবোধে আচ্ছন্ন ছিলেন :

> মুসলমান কথা মনেত ডড়াই
> রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই।

বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেও, যখন শিক্ষিত মুসলমান বাঙালী সাহিত্য চর্চা করছে, বাংলা সহিত্যে লক্ষণীয় অবদান রাখছে, মুসলমান বাঙালীর মন থেকে ভাষিক দ্বন্দ্ব দুর হচ্ছে না, তাঁর ভাষা কি বাংলা না উর্দু এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অর্থাৎ ডাইকোটমিতে ভুগছে, ফলে তাঁর মন দ্বিধায় আচ্ছন্ন রয়েছে, বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের আগ পর্যন্ত, সে কি মুসলমান না বাঙালী ? পাকিস্তানী আমলেও এক শ্রেনীর বুদ্ধিজীবী কবি সাহিত্যিকও খাঁটি মুসলমানে হওয়ার আশায় বাংলা ভাষাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য অহ্বান জানিয়েছিলেন। এ ধরণের চিন্তার ধারকদের প্রতিনিধিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন কবি গোলাম মোস্তাফা, যিনি বাংলায় কবিতা লিখে নিজের নামের আগে কবি শব্দ সর্বদাই ব্যবহার করতেন, নিজেকে কাজী নজরুল ইসলামের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন এবং পুর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি হবার বাসনায় এন্তার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন, পাকিস্তানের দুটি অংশকে একই ভাষা ও সাংস্কৃতিক সুত্রে গাঁথার এক অগ্রসৈনিক ছিলেন । যে ভাষায় তিনি কাব্য চর্চা করতেন সেই বাংলা ভাষা সম্স্লর্কে কটুক্তি করছেন, হিন্দুয়ানির গন্ধ পেয়েঃ

> Not only Bengali literature, even Bengali alphabet is full of idolatry. Each Bengali letter is asocoated with this or that god or goddess of Hindu pantheon .. .. the Arabic language and script must be the best language and the script in the world.

এ ধরণের অসংলগ্ন বক্তব্য দিয়েছিলেন ভাষা আন্দোলনের সময় ও তার আগে- উদ্দেশ্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি, পেছন থেকে আন্দোলনের ওপর ছুরিকাঘাত করা, এবং পাকিস্তানীদের কাছে প্রিয়ভাজন হয়ে কিছু প্রপ্তির আশা। এ ধরণের চিন্তার সাথে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের আর এক কবি, এককালে বাংলা একাডেমীর যিনি পরিচালকের পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন আয়ুব-মোনায়েম খানের সেবা করার পুরষ্কার হিসেবে, যার রবীন্দ্রসাহিত্য বিরোধিতা কিংবদন্তীতুল্য, জনাব সৈয়দ আলী আহসান সেই পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই মন্তব্য করেছিলেন - "আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশী।" নিয়তির কি পরিহাস, ইসলাম ও পাকিস্তানের এই সৈনিক কিন্তু একাত্তেরে রণক্ষেত্রে পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে পালিয়ে গিয়ে কোলকাতা থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শব্দ সৈনিক হওয়াই বেশী পছন্দ করেছিলেন। একেই বোধ হয় বলে ঠেলার নাম বাবাজী। অবশ্য পরে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে 'তওবা' করে পুনরায় পাকিস্তান ও ইসলামের সেবা করেছেন আমৃত্যু । এঁদের এসব বক্তব্য কিন্তু আমাদের বিপুল সংখ্যক লেখক বুদ্ধিজীবীদের বিপরীত স্রোতের লেখা। মুল স্রেতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ভাষাবিদ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, বিজ্ঞানী কাজী মোতাহার হোসেন, পল্লীকবি জসীমুদ্দিন, শিক্ষাবিদ কুদরাত ই খুদা, শিক্ষক মুনীর চৌধুরী প্রমুখ । আমাদেরকে পাকিস্তানী, বিশুদ্ধ মুসলমান বানাবার, এবং আমাদের ন্যুনপক্ষে হাজার বছরের ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে ইসলামীকরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করার অপর নামই ছিল 'ভাষা আন্দোলন'- যা শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালে এবং পরিণতি পেয়েছিল বাহান্নর রক্তাক্ত বিপ্লবে। আমরা এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রতিনিধিত্বকারী হিসেব মুহম্মদ

শহীদুল্লাহ ও কাজী মোতাহার হেসেনের মত উদ্ধৃত করছি। ১৯৪৭ সালে লেখা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' প্রবন্ধে শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার পক্ষে দ্ব্যর্থহীন মত প্রকাশ করেছিলেন ঃ

> বাংলা দেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দী ভাষা গ্রহণ করা হইলে, ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতার নামান্তর হইবে। ডাঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার সপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিতও বটে।

প্রবন্ধটির প্রারম্ভে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার দাবী সম্পর্কে তিনি উক্তি করেছেন,

> .. .. কিন্তু উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেই মাতৃভাষারূপে চালু নয়। .. .. যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই।

তবে দ্বিতীয় কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হলে তিনি উর্দুর দাবীকে বিবেচনায় আনতে বলেন। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী রাখার পক্ষেও মত ব্যক্ত করেছিলেন। (দৈনিক আজাদে প্রকাশিত, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৫৪)। এছাড়া ১৯৪৮ সালে পুর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মুল সভাপতি হিসেবে তিনি জাতীয় সাহিত্য সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা ভাষা আন্দোলনকারীদের উদ্দীপ্ত করেছে ঃ

> স্বাধীন পুর্ব বাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্ব শাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য। .. .. এই সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়।

বাংলা দেশের নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি ঐ ভাষণেই বলেছিলেন,

> পুর্ব বাংলার বিশেষ গৌরব এই যে এই প্রদেশের প্রাচীন নাম বঙ্গাল (বা বাঙ্গাল) থেকে সমস্ত দেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা বা বাংলা।

এই বঙ্গাল নাম আমরা পাই রাজেন্দ্র চোলের তিরুমল লিপিতে (১০২৩)। বৌদ্ধ যুগের কবি ভুসুক একটি চর্যাগীতিতে বলেছেন,

> বাজ-ণাব পাড়ী পউআঁ খালেঁ বাহিউ।
> অদ্বয় বঙ্গাল দেশ লুড়িউ।
> (বজ্রযানরূপ নৌকায় পাড়ি দিয়ে পদ্মার খালে বাইলাম, অদ্বয়রূপ বঙ্গাল দেশ লুট করলাম।)

পাকিস্তান আন্দোলন ও তৎপরবর্তী সময়ে একটি মহল বাংলাকে আরবী হরফে লেখার জন্য দাবী তুললে- সেই প্রসঙ্গ ধরে ড. শহীদুল্লাহ একই বর্ক্তৃতায় বলেন,

> কিছুদিন থেকে বানান ও অক্ষর সমস্যা দেশে দেখা দিয়েছে। স্বাধীন পুর্ব বাংলায় কেউ আরবী হরফে, কেউ বা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছে ন। .. .. যদি পুর্ব বালার বাইরে বাংলা দেশ না থাকত আর যদি গোটা বাংলা দেশে

> মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত, তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হত না। আমাদের বাংলা ভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। .. .. আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে।

কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সব চাইতে গুরুত্বপুর্ণ মন্তব্য ছিল আমাদের বাঙালীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে যা কট্টর পাকিস্তানীদের উষ্মার কারণ ঘটায়ঃ

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বড় সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটা কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীদের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।

শহীদুল্লাহর এই মন্তব্য পাকিস্তানের তাত্ত্বিক ভিতটিকেই নাড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের সেক্যুলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবান করেছিল। তীব্র সমালোচনা সত্তেও এই নির্ভিক ভাষাবিদ তাঁর অবস্থান থেকে সরে যান নি। এমন কি ১৯৫৭ সালেও কাগমারী সম্মেলনে আবারও মুল সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন,

> আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী ফারসী শব্দের অবাধ আমদানী, সাহিত্যককে প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একজনকে পেয়ে বসলো। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা .. .. এমন কি বাঙালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন।

এই 'কেউ কেউ'র উত্তর পুরুষেরা যে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরও বাংলাদেশে বহাল তবিয়তে থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমাদের বাঙালী পরিচয়টিকে মুছে দিয়ে বাংলাদেশী বানিয়ে সেই পাকিস্তানী ভুতকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে- একথা দিবালোকের মত সত্য।

আর এক বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানী কাজী মোতাহার হেসেন ১৯৪৭ সালেই বাঙালী মুসলমানের মানসিক সঙ্কটের দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন,

> .. .. মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবহেলা, আর ধর্মীয় ভাষা সম্পর্কিত মনে করে বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষার প্রতি অহেতুক আকর্ষণ বা মোহ। তাতে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, বাঙালী মুসলমানের সত্যিকার সভ্যতা বলতে কোন জিনিষই নাই- পরের মুখের ভাষা বা পরের শেখানো বুলিই যেন তার একমাত্র সম্পদ। স্বদেশে সে পরবাসী।

অন্যদিকে উর্দুর সমর্থকদের মুল তাত্ত্বিক বক্তব্য ছিল ইসলামের অনুসারীদের কোন আঞ্চলিক জাতীয়তা বলে কিছু থাকতে পারে না, সেই অর্থে পুর্ব বাংলায় বসবাসকারী মুসলমানরাও বৃহত্তর মুসলিম উম্মার অংশ- তাদের তাহজিব্ তমুদ্দুন হবে কোরান ও সুন্নাহ ভিত্তিক- এখানে স্বাদেশিকতার কোন স্থান নেই। এদের দৃষ্টিতে উর্দু হল ইসলামের ভাষা, অন্যদিকে বাংলা হল পৌত্তলিকতার ভাষা যার আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে 'হিন্দুয়ানি' গন্ধ। এদের বক্তব্য নীচের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হবেঃ

> একদল লোক নিজেদের বিরাট সাহিত্যিক, শিল্পী ও পণ্ডিত বলে জাহির করে উর্দুর বিৎন্দ্ধে প্রচরণা শুরু কওেছে। ... তারা উর্দুকে জাতীয়তাবিরোধী (বাঙালী জাতিয়তাবোধ কে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে- বর্তমান লেখক) বিদেশী ভাষা হিসাবে বর্জন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। .. .. (তারা) বাংলার মতো এমন এক ভাষার দাবী তুলছে, যে-ভাষার একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভের মত যোগ্যতা একেবারেই নেই। মুসলিম সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী

> উর্দু ভাষাকে বর্জন করার এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টা যে শুধু ধ্বংসাত্মক নয়, তা পশ্চাদমুখী, নিন্দনীয়, এবং সর্বোপরি সার্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। .. .. উর্দু এখনো সেই প্রেরণাদায়ী শক্তি, যা এই বিশাল উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমানকে একতাবদ্ধ করতে পারে .. ..। পৃথক সংস্কৃতি, ইতিহাস, ... দ্বারা গঠিত ভারতের মুসলমানদের পৃথক জাতির উপর ভিত্তি করেই পাকিষ্টণ্ডান ধারণার জন্ম। ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় ভাষা এবং ইসলাম ও আধুনিক ... সাহিত্যে সমৃদ্ধ উর্দুই পুর্ব এবং পশ্চিম পাকিষ্টণ্ডানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার জন্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ভাষা। (১৯৪৭ সালে তখনকার পুর্ব বাংলার মুখ্যমড্ডঙ্গী খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে প্রেরিত উর্দু সমর্থকদের, এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষক-অধ্যাপকও ছিলেন, স্মারকলিপি - এটি মর্নি নিউজে ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে,১৯৪৭, প্রকাশিত হয়)

এই মতের নেতৃত্বে ছিলেন কবি গোলাম মোস্তাফা, তৎকালের পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষাম ন্ত্রী ফজলুর রহমান, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন প্রমুখ। এদেরই মুখপত্র ছিল ঢাকার 'মর্নিং নিউজ' গোষ্ঠী ।

১৯৪৮ সালের আন্দোলন

সুচনা লগ্নে বাংলা ভাষাকে নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের এই সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যে, প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে এবং সবশেষে জনতার কাছে হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। ভাষা আন্দোলনই হল আমাদের ভাষাভিত্তিক জাতি সত্তার উন্মেষের প্রথম পর্ব। এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই। বাঙালী জনগণের আশা ভঙ্গ হতে দেরী হয় নি। পাকিস্তান সৃষ্টি যে পুর্বাঞ্চলকে একটি উপনিবেশে রূপান্তরের সামিল একথা বুঝতে শেরে বাংলা, শহীদ সেপহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, সামসুল হক, তরুণ শেখ মুজিব ও তাজুদ্দিন আহমদদের বুঝতে দেরী হয় নি। ভাষা আন্দোলন যে আমাদের জাতীয় সত্তার ভিত্তি রচনা করেছিল আজ তা কে অস্বীকার করবে ? এ প্রসঙ্গে ৫০'এর ভাষা আন্দোলনের দু'জন নেতার বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন মনে করতেন যে ভাষা আন্দোলন ছিল ছাত্র-জনতার আত্ম প্রত্যয়ের ফসল; আর এই সাফল্যের পশ্চাতে ছিল জনগণের মধ্যে বাঙালী জাতি সত্তার প্রবল অনুভুতি,

> ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে .. .. জনগণ দেখল .. .. টাকা, ডাকটিকেটে, এনভেলপে মনিওর্ডার ফর্মে .. .. বাংলা হরফ নেই। এভাবে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়া হলে পুর্ব বাংলার জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শাসকের চরিত্র এবং উদ্দেশ্য সম্স্লর্কেও প্রশ্ন দেখা দেয়। এদেশের জনগণ মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করে। তাদের মধ্যে বাঙালী জাতিসত্তা বোধ প্রবলভাবে অনুভুত হয়।

অন্যজন হলেন সে সময়কার অর্থাৎ ৪৮'এর ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও ছাত্রলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তার উপলব্ধি হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার নামে প্রাপ্ত স্বাধীনতা ছিল 'ফাঁকির স্বাধীনতা' - এ ছিল 'এক শকুনের হাত থেকে আর এক শকুনের হাতে পড়া' । তাঁর দৃষ্টিতে,

> ১৯৪৭ সালের পুর্বে আমরা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছিলাম তখন আমাদের স্বপ্ন ছিল আমরা স্বাধীন হব। কিন্তু সাতচল্লিশেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমরা নতুন করে পরাধীনতার শৃঙ্কলে আবদ্ধ হয়েছি।

এই উপলব্ধিই দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁকে পরিণত করেছিল বঙ্গবন্ধুতে এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্থপতিতে।

১৯৪৭ সালে অক্টোবর মাসে মুখ্যত তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক আবুল কাসেমকে সভাপতি এবং রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষক নুরুল হক ভুইয়াঁকে আহ্বায়ক করে। সুচনা লগ্নে তমদ্দুন মজলিসের একটি পজিটিভ ভুমিকা ছিল- তাদের দাবী ছিল ঃ

ক. বাংলা ভাষা হবে পুর্ব বাংলার শিক্ষা আদালত ও অফিসের ভাষা
খ. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দুটি -- উর্দু ও বাংলা

ভাষা আন্দোলন এভাবে এগিয়ে যেতে থাকলে আন্দোলনকে আরও বেগনান করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় জনাব শামসুল আলমকে আহ্বায়ক করে। ভাষা আন্দোলনের এই পর্যায়ে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ও উল্লেখযোগ্য ভুমিক পালন করেছিলেন এদের মধ্যে কামরুদ্দিন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ, নইমুদ্দিন, কাজী গোলাম মাহবুব, মোহাম্মদ তোহা প্রমুখদের নাম উল্লেখ করতেই হয়। সংগঠনের মধ্যে তমদ্;ুন মজলিস ছাড়াও গণ আজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, ছাত্র ফেডারেশন, পুর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ। ১১ই মার্চে সাধারণ ধর্মঘট পালনের ব্যপক প্রস্তুতি চলে এবং আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। ধর্মঘটের দিন পুলিশি নির্যাতনের মুখে অনেক ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়- যাদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, তাজুদ্দিন আহমেদ, শওকত আলী প্রমুখ।

আন্দোলনের ব্যপকতা লক্ষ্য করে পুর্ব বাংলা সরকার নমনীয় হলে, ছাত্রদের সাথে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নাজিমুদ্দিনের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (১৫ই মার্চ ১৯৪৮), যার সার কথা ছিল বাংলা ভাষাকে উর্দুর সম মর্যাদায় পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা ও সরকারী ভাষা হিসেবে পুর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব পাশ করানো হবে, এবং তা কেন্দ্রীয় গণ পরিষদে পরে যথাযথভাবে উত্থাপিত হবে। ছাত্রদের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন জনাব কামরুদ্দিন আহমেদ।

জিন্নাহর ঢাকার ভাষণে উর্দুর পক্ষে ওকালতি এবং ছাত্রদের ঐতিহাসিক 'নো নো' ধ্বনি।

এই চুক্তি যে নেহাত ধাপ্পা ও আন্দোলনকে স্তিমিত করার কৌশলমাত্র, একথা ছাত্রদের বুঝতে দেরী হয় নি। চুক্তিতে যদিও স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল যে রাষ্ট্রভাষার দাবী দেশের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, তথাপি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এলে তাঁকে দিয়ে প্রথমে রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় (২১ শে মার্চ, ১৯৪৮) এড়ংং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে (২৪ শে মার্চ, ১৯৪৮) বলান হয় যে ভাষা আন্দোলন কম্যুনিস্ট, হিন্দু ও পাকিস্তানের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন,

> .. .. Let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going tobe Urdue and no other language. Any one who tries to mislead you is really enemy of Pakistan.

একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায়,

> Let me restate my views on the question of a state language for Pakistan. .. .. There can however, be only one lingua franca, that, the language for inter communication between the various provinces of the state, and the language should be Urdue and cannot be any other.

সে সময়কার সম্ভবত সবচাইতে বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রনেতা তাজউদ্দিন আহমদ তার ডাইরীতে 'কায়দে আযমের' রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ২১শে মার্চের বক্তৃতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন (বাংলা অনুবাদ)*,

> ২১ শে মার্চ, রবিবার
>
> .. ..
>
> বিকেল সাড়ে চারটায় রেসকোর্স ময়দানে কায়দে আযমের জনসভায় গেলাম। কাযদে অযম এলন সোয়া ৫টায়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে নবাবের বক্তৃতার পর কায়দে আযম পৌনে ৬টায় তার বক্তৃতা শুরু করলেন। পৌনে সাতটা পর্যন্ত ১ ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। তিনি মন্ত্রীসভা ও মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচার চালালেন এবং সাম্প্রতিক ভাষা আন্দোলনের নিন্দা করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। পুর্ব বাংলার সরকারী ভাষা বাংলা হবে কি না সে চুড়ান্তরূপে সিদ্ধান্ত নিতে বললেন। ছাত্রদের সাবধান করে দিলেন এবং প্রায় সরাসরি শত্র হিসেবে আখ্যায়িত করলেন।
>
> .. ..
>
> বি.দ্র: কায়দে আযমের ভাষণ এ প্রদেশের সবাইকে আহত করেছে। প্রত্যেকেই নিদারুণ বিরক্ত-- তিনি দলের ওপরে উঠবেন সবাই সে আশাই করেছিল।

ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা জনাব আব্দুল মতিন জিন্নার এই ভাষণ সম্স্লর্কে বলেছেন যে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে প্রদত্ত ভাষণের প্রতিবাদ করেছিল ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই 'নো নো' ধ্বনির মধ্য দিয়ে। জিন্নাহর এই ঘোষণায় ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হলেও ভাষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জিন্নার সাথে ২৪ শে মার্চ সন্ধ্যে ৬-৩০ মিনিটে সাক্ষাৎ করেন চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের বাসভবনে, যদিও জিন্নাহ প্রথম দিকে সাক্ষাৎ দানে সম্মত ছিলেন না। এর পরও যখন জানলেন যে ছাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন হিন্দু ছাত্র রয়েছে, তখন তিনি এদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অসম্মত হন। যখন তাকে জানান হল যে ছাত্রটি ডাকসুর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তাকে ছাড়া ছাত্ররা জিন্নার সাথে কথা বলবেন না, তখন তিনি সম্মত হয়েছিলেন। প্রতিনিধিদেও মধ্যে ছিলেন শামসুল হক, কামরুদ্দিন আহমেদ, আবুল কাসেম, তাজুদ্দিন আহমেদ, মহম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, অলী আহাদ, নইমুদ্দিন আহমেদ, শামসুল আলম এবং নজরুল ইসলাম। ছাত্রদের প্রদত্ত স্মারকলিপিতে ছাত্ররা উল্লেখ করেছিল যে, "... যে পর্যন্ত না আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সে পর্যন্ত বাংলা ভাষার জন্য এই আন্দোলন চালাইয়া যওয়া হইবে।" বলা বাহুল্য এই সাক্ষাৎকার সফল হয় নি। জিন্নাহ ছাত্রদের কোন ছার দিতে রাজী হন নি। পরে ঐ বছরে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৮ই নভেম্বর তারিখে ঢাকায় এল তাঁকেও সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় দেয়া হয়। যথারীতি প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্র ভাষা প্রসঙ্গে সরাসরি কোন বক্তব্য রাখেন নি। লিয়াকত খানের

---

* বাংলাদেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রী শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন তাঁর কালে সবচাইতে প্রতিভাদীপ্ত ছাত্রনেতা- তখন থেকেই ডাইরী লিখতেন নিয়মিত, তবে ইংরেজীতে। সম্প্রতি ১৯৪৭-১৯৪৮ পর্বের লেখাগুলো বাংলায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে "তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী" শিরোনামে, প্রতিভাস, ১৯৯৯।

হত্যার পর খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধান মন্ত্রী হলে তিনি তাঁর সব প্রতিশ্র□তি ভুলে গিয়ে জিন্নার মতই ঘোষণা দেন যে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'।

বাহান্নর রক্তদান

লিনোকাট
শিল্পী ঃ মূর্তজা বশীর

ভাষা আন্দোলনের এই 'আটচল্লিশ পর্ব' নানা কারণে স্তিমিত হয়ে পড়লেও, ১৯৫০ সালে তা পুনরায় বেগবান হয়ে ওঠে। পাকিস্তান রাজনীতিতেও নানা পালা বদল ঘটতে থাকে। এ বছরই ১১ মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম' কমিটি গঠিত হয়, এর পর সম্ভবত ৩০-৩১শে জানুয়ারী ১৯৫২'তে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ভাষা আন্দোলন যখন ক্রমশ গতি লাভ করছিল এবং গণদাবীতে রূপান্তরিত হচ্ছিল, সে সময় অনেকটা হঠাৎ করেই পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ২৭শে জানুয়ারী (১৯৫২) পল্টন ময়দানের এক জন সভায় ঘোষণা দেন যে কেবল উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হবে। এর প্রতিবাদে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সারাদেশ ব্যাপী 'ঢা.বি. সংগ্রাম কমিটি' ও 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে পাঁচ হাজারেরও বেশী ছাত্র-জনতার এক মিছিল বের হয়- আর মিছিলে শরিক হন জননেতা মওলানা ভাসানী সহ অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। সেই জনসভাতেই ঘোষণা করা হয় ২১শে ফেব্রুয়ারীতে রষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবীকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হবে। এই দুই সংগ্রাম পরিষদ সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে থাকে। সরকার ভীত হয়ে নিবর্তনমুলক পদক্ষেপ হিসেবে ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত থেকে একমাস ব্যাপী ১৪৪ ধারা জারী করে ঢাকা জেলার সর্বত্র।

'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ১৪৪ ধারা ভঙেত্ম বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও 'ঢা.বি. সংগ্রাম কমিটি'র নেতৃবৃন্দ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরদিন জনাব গাজিউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলা ভবনের ছাত্র সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ১০ জন করে মিছিল বের করার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলাফল সবারই জানা। বাহান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে পুলিষের গুলিতে প্রাণ দিল ছাত্র জনতা। শহীদ হলেন সালাম, বরকত, শফিক, শফিউর রহমান .. .. কি বিষন্ন একগুচ্ছ থোকা থোকা নাম।

এর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় ভাষা আন্দোলনের সবচাইতে গুরুত্বপুর্ণ এক রক্তাক্ত অধ্যায়। ছাত্রদের ওপর নেমে আসে নুরুল আমীন সরকারের পুলিশি নির্যাতন ও অত্যাচার; ছাত্র নেতৃবৃন্দ হয় কারারূদ্ধ বা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরাও রেহাই পায় নি।

একুশের প্রথম স্মরণিকা

নুরুল আমীন সরকারের দমন নীতির ফলে সাময়িকভাবে ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেলেও পরের বছর থেকে তা পুনরায় দানা বাঁধতে শুরু করে। এরই ফলশ্রুতি হল একুশের প্রথম স্মরণিকা সঙ্কলন। 'একুশে ফেব্রুয়ারী' শিরোনামে প্রকাশিত হয় তখনকার তরুণ কবি ও লেখক হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায়, ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে। এ সঙ্কলন প্রকাশ করার ব্যাপারে নেপথ্য থেকে যে ব্যক্তিটি সবচাইতে সক্রিয় ছিলেন তিনি হলেন ভাষা সৈনিক মোহাম্মদ সুলতান। বইটি প্রকাশ করেছিলেন 'পুঁথিপত্র প্রকাশনী' মোহাম্ম সুলতানের নামে। প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম এবং বইয়ের অভ্যন্তরে রেখাচিত্রাঙ্কন করে বইটিকে জীবন্ত ভাষা দিয়েছিলেন জনাব মুর্তজা বশীর। বলা বাহুল্য 'একুশে ফেব্রুয়ারী' হল আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম সাহিত্য সঙ্কলন। সেদিক থেকে এর একটি আলাদা ঐতিহাসিক মর্যাদা ও কালাতীত আবেদন রয়েছে।

সঙ্কলনটি সাজানো হয়েছে একটি প্রবন্ধ, একুশের কবিতার অন্তর্ভাগে শামসুর রহমান সহ ১১ জন কবির কবিতা গুচ্ছ, একুশের গল্পের বিভাগে শওকত ওসমান সহ ৫জন কথাশিল্পীর একুশ'কে নিয়ে গল্প, একুশের নকশা শিরনামের অধীনে কয়েকটি নকশাচিত্র, দুটি একুশের গান। সঙ্কলনটি শেষ হয়েছে ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ১০টি দিনের 'ঘটনা' একুশের ঘটনাপুঞ্জী শিরোনামের অধীনে। এটি লিপিবদ্ধ করেছেন কবির উদ্দিন আহমেদ।

সঙ্কলনটির সম্পাদকীয়টির শিরোনাম 'একুশে ফেব্রুয়ারী'। এর শুরুটি এভাবেঃ

> একটি মহৎ দিন হঠাৎ কখনো জাতির জীবনে আসে যুগান্তের সম্ভবাবনা নিয়ে। পুর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারী এমনি এক যুগান্তকারী দিন।
>
> শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে নয়, একুশে ফেব্রুয়ারী সারা দুনিয়ার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। দুনিয়ার মানুষ হতচকিত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য পুর্ব পাকিস্তানের জনতার দুর্জয় প্রতিরোধের শক্তিতে, শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছে ভাষার দাবীতে পুর্ব পাকিস্তানের তরুণদের এই বিশ্ব ঐতিহাসিক আত্মত্যাগে।

অন্যত্র আবার বলা হচ্ছে,

> একুশে ফেব্রুয়ারী পুর্ব পাকিস্তানে শুধু গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই জোয়ার সৃষ্টি করে নি, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এনেছে দিগন্ত-বিসারী প্লাবন। প্রতিক্রিয়ার নির্মম হিংসা ও লোভের আগুন থেকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্য দেশজুড়ে জনতার যে দুর্জয় ঐক্য গড়ে উঠেছে, পুর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে তার কোন নজির নেই।

সম্পাদকীয়টিতে একুশের আন্দোলনের মুল্যায়ন এভাবে করা হয়েছে–

> .. .. একুশে ফেব্রুয়ারী পুর্ব পাকিস্তানের জনতাকে পথ দেখিয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারী দেখিয়েছে জনতার সকল শ্রেণীর প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হলে প্রতিক্রিয়ার সমস্ত ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করা সম্ভব।

সম্পাদকীয়টি শেষ হয়েছে এই বলে-

> একুশে ফেব্রুয়ারী তাই পুর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি অশেষ গৌরবমণ্ডিত ক্রান্তি কালের দিন। একুশে ফেব্রুয়ারীকে সালাম ! পুর্ব পাকিস্তানের নব জাগ্রত জনতার বিজয়াভিযানকে সালাম।

'সকল ভাষার সমান মর্যাদা' শিরোনামে লেখা জনাব আলী আশরাফের প্রবন্ধটি ভিন্ন স্পিরিটে রচিত- বাংলা ভাষার পাশাপাশি পাকিস্তানের অন্যান্য প্রাদেশিক প্রত্যেকটি ভাষার জন্য দাবী করেছেন সমান মর্যাদার। তিনি মনে করতেন, "শুধু বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চান, তাহলে সিন্ধীভাষী, পস্তুভাষী পাঞ্জাবীভাষী ও গুজরাটীভাষী জনগনের উপর ঐ দুটি ভাষা চাপিয়ে দেয়া হবে। এটাও হবে স্বৈরাচারী ও গণতন্ত্র বিরোধী। পাকিস্তানের জটিল ভাষা সমস্যার সমাধান হিসেবে তাঁর বক্তব্য ছিল–

> কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সমস্ত আইন, ঘোষণা, দলিল প্রভৃতি বাংলা, উর্দু , সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পস্তু ও বেলুচি ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। .. .. মুল নীতি হবে যে, পাকিস্তানের জনগণের প্রধান প্রধান ভাষাকে কেন্দ্রীয় সরকারের সব দলিলাদিতে প্রকাশ করতে হবে।

এজন্য তাঁর সুপারিশ ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বা 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই দাবীর পরিবর্তে আমাদের ভাষা আন্দোলনের মুল শ্লোগান হওয়া উচিত ছিল, "সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই"। কিন্তু পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশে ভাষার আন্দোলন গড়ে না ওঠায়, ভাষা আন্দোলনের মুল শ্লোগান হয়ে দাঁড়ায়, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। আলী আশরাফের বক্তব্য পুর্ব বালার জনতার কাছে কোন দাগ কাটে নি।

একুশের কবিতার অংশে ১ম কবিতাটি ছিল শামসুর রহমানের, অবশ্য শামসুর রহমান তখন 'শামসুর রহমান' হয়ে ওঠেন নি; তিনি কবিতাটি শেষ করেছেন এভাবে ঃ

> দোহাই চেঙ্গিসের উলঙ্গ তরবারির হিংস্রতার
> দোহাই ফ্যারাওনের মওমিগন্ধি বীভৎসতার
> দোহাই তৈমুরের পৈশাচিক রক্ত নেশার
>
> তোমরা নিশ্চিহ্ন করে দাও আমার অস্তিত্ব,
> পৃথিবী হতে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দাও
> উত্তরাকাশের তারার মতো আমার ভাস্বর অস্তিত্ব,
> নিশ্চিহ্ন করে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও।।

হাসান তার কবিতার এক স্থানে কি হৃদয় নিংরানো ভাষায় লিখছেন,

> যাঁদের হারালাম তাঁরা আমাদেরকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল
> দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, কণা কণা করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল
> দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতর মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে।
> আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার
> কি আশ্চর্য, কি বিষন্ন নাম! একসার জ্বলন্ত নাম।

কবি-কথাশিল্পী আলাউদ্দিন আল আজাদের সেই অমর পংক্তিগুলো- যা আজও আমাদের প্রেরণা জোগায় এখানেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
চারকোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো! যে ভিৎ কখনো কোন রাজন্য
পারেনি ভাঙতে ।
.. ..
ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক! একটি মিনার গড়েছি আমরা
চারকোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।

আরও লিখেছেন, আবদুল গণী হাজারী, আনিস চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ সামসুল হক প্রমুখ কত পরিচিত জনেরা যাঁরা একুশের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে অমর অবদান রাখলেন।

ছোট গল্প অংশে শওকত ওসমান ছাড়াও লিখেছেন সাইয়িদ আতিকুল্লাহ্, আতোয়ার রহমান, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম।

একুশকে নিয়ে স্মৃতিচারণমুলক কথার নকসা একেছেন মুর্তজা বশীর 'একটি বেওয়ারিশ ডায়েরীর পাতা' শিরোনামে, এবং সালেহ আহমদ একেঁছেন 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর রক্তাক্ত স্বাক্ষর।' সালেহ আহমেদের নকসাচিত্রে ২১'শের ঘটনার খন্ডচিত্রের একটি স্থানের বর্ণনা-

ছাত্রাবাসের গোটাকয়েক বাঁশের চালা ফুটো হলো এবং সেই ফুঁটোগুলোর ভেতর দিয়ে ধোঁয়ার আনাগোনা চলতে লাগল নির্বিকারে।
আওয়াজ হোল।
"রাষ্ট্রভাষা -- বাংলা চাই-ই" .. ..
আওয়াজ হোল। পর পর। এদিকে সেদিকে।
আমার চোখের সামনে আমাদেরি ছাত্র ভাইয়ের গোড়ালিটা উড়ে গেল। রক্তেত্ম ধারা মাটিতে এসে নামল। আমরা সবাই তাকালুম ওদিকে। আমরা যেন শিমুলের সমারোহ দেখছি।

একটি বুলেট ঢুকল আমাদেরি এক ছাত্র ভাইয়ের পেটে। যকৃৎ, পাকস্থলী, প্লীহা, অন্ত্র, মুত্রালয়, আর শিরা-ধমনীকে সুতোর মত ছিঁড়ে দিল বুঝি এক লহমায়।

আওয়াজ হোল। "রাষ্ট্রভাষা -- বাংলা চাই, আমাদের দাবী মানতে হবে"- আর গোটাকতক ছাত্র ওদিক এগিয়ে গেল। বুকে জড়িয়ে ধরতে গেল শহীদকে।

সাথে সাথে উড়ে এল বুলেট। আমাদের ভেতর থেকে একজনের মাথার খুলির অর্ধেকটা উড়ে গেল। মস্তিষ্কের পিণ্ডটা ছিঁড়ে গেল কুটিকুটি হয়ে। একটা সুর্যমুখীর স্বর্ণরেণুগুলো যেন ঝরে পড়লো। আশ্চর্য্যভাবে ঝরে পড়লো।

একুশের গান হিসেবে দুটি কবিতা সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে, একটির রচয়িতা আবদুল গফ্ফার চৌধুরী, সেই অবিস্মরণীয় কালজয়ী পংক্তিমালা

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি .. ..

অন্য গানটি লিখেছিলেন তোফাজ্জল হোসেন ঃ

রক্ত শপথে আমরা আজিকে তোমারে স্মরণ করি
একুশে ফেব্রুয়ারী .. ..

সঙ্কলনে একুশের ঘটনাপঞ্জীতে ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছেঃ

২১ শে ফেব্রুয়ারী ঃ

এই দিন সকাল থেকেই শহরের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটা চরম ঘৃণা ও ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। কর্মীদের প্রবল প্রচার কার্যের ফলে জনসাধারণের মধ্যে আগে থেকেই ধর্মঘটের অনুকুলে মনোভাব সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। .. .. বেলা ১২টার মধ্যে সকল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলো। প্রায় সাড়ে ১২টার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হল। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক জনাব আবদুল মতিন আন্দোলনের পুর্বাপর পর্যায় ও ১৬৬ ধারা প্রবর্তনের ফলে উদ্ভুত বিশেষ সংকট-জনক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের উপওেই ১৪৪ ধারা সম্স্লর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন।

তখনই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে শামসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাবার জন্য বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু ছাত্রদের আন্দোলন সম্স্লর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখে বিপর্যস্ত হয়ে তিনি তাঁর সহকর্মীগণ সহ সভা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। .. .. ছাত্ররা সুদৃঢ় আত্মচেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সংহত অভিমত ঘোষণা করল।

সঙ্গে সঙ্গে সভা ভঙ্গ করে "দশজনী মিছিল" বের করারজন্য ছাত্ররা শ্লোগান দিতে দিতে গেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গেটের বাইরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল আই, বি ও পুলিশবাহিনী। ছাত্রদের প্রথম 'দশজনী' মিছিল শ্লোগান দিয়ে বের হতেই পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে তাদের ট্রাকে ভর্তি করে নিল দেখতে দেখতেই অসংখ্য ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে অনেকগুলি ট্রাকে ভরে তাদের লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এত গ্রেপ্তার পরও ছাত্রদের দমন করতে না পেরে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ তখন কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ল রাস্তার পাশে আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। উপর্যুপরি কয়েকবার কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ার পর ছাত্ররা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরে ঝাঁপ দিতে থাকে। .. .. ছাত্ররা তখন উত্তেজনা আর যন্ত্রণায় অধিকতর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রায় বেলা ২টা পর্যন্ত মিছিল করে ছাত্ররা বীরত্বের সাথে গ্রেফতারী বরণ করতে থাকে, আর ধীরে ধীরে তারা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে গিয়ে জমায়েত হতে থাকে। .. .. বেলা প্রায় সোয়া তিনটার সময় এম, এল, এ ও মন্ত্রীরা মেডিক্যাল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদ ভবনে আসতে থাকে। ছাত্ররা যতই শ্লোগান দেয় আর মিছিলে একত্রিত হয় ততই পুলিশ তাদের উপর বেপরোয়া হানা দিতে থাকে। কয়েকবার ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছুরে তাড়া করতে করতে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ভেতর ঢুকে পড়ে। হোস্টেল প্রাঙ্গণে ঢুকে ছাত্রদের উপর আক্রমণ করায় এরপর ছাত্ররা বাধ্য হয়ে ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। একদিকে ইট-পাটকেল আর অন্যদিক থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠিচার্জ আসে। পুলিশ তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থল আবদুল জব্বার ও রফিকুদ্দিন আহম্মদ শহীদ হন, আর ১৭ জনের মত গু রুতরভাবে আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে সরানো হয়। তাঁদের মধ্যে রাত আটটার সময় আবুল বরকত শহীদ হন।

গুলি চালনার সাথে সাথেই পরিস্থিতির অচিন্তনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ছাত্র ছাত্রীদের চোখে মুখে যেন ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুন ঝরতে থাকে। মেডিক্যাল হোস্টেলের মাইক দিয়ে তখন পুলিশি হত্যাকাণ্ডের তীব্র

প্রতিবাদ করা হয়। আইন পরিষদের সদস্যদের প্রতি ছাত্রদের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করার দাবীও জানান হয়। ১৪৪ ধারার নাম নিশানাও তখন আর পরিলক্ষিত হয় না। .. .. অফিস আদালত সেক্রেটারিয়েট ও বেতার কেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে। শহরের সমস্ত লোক তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে এসে হাজির হতে থাকে। রাস্তায় আর অলিতে গলিতে যেন ঢাকার বিক্ষুব্ধ মানুষের ঝড় বয়ে চলে প্রবলভাবে .. । মেডিক্যাল হোস্টেলের ব্যরাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। মাইক দিয়ে যখন শহীদদের নাম ঠিকানা ঘোষণা করা হচ্ছিল তখন সমস্ত মানুষের মন থেকে যেন সমস্ত ভয়, ত্রাস মুছে গেছে, চোখে মুখে সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিরোধের দুর্জয় শপথ প্রকাশিত হয়ে উঠেছে প্রতিটি মুখের রেখায় রেখায়।

বাইরের এমনই তুমুল পরিস্থিতির ঢেউ এসে লেগেছে পরিষদ কক্ষে। পরিষদের বিরোধী দলের সদস্যরা নুরুল আমিনের কাছে ছাত্রদের উপর গুলি চালনার কৈফিয়ৎ দাবী করেন এবং পরিষদ মুলতুবি রাখার দাবী জানান। নুরুল আমিন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, "কয়েকজন ছাত্র গুরুতর রূপে আহত হয়েছে শুনে আমি ব্যথিত হয়েছি, তাই বলে আমাদেরকে ভাবাবেগে চালিত হলে চলবে না।' পরিষদ কক্ষেই এমনি জঘন্য মনেবৃত্তির তীব্য প্রতিবাদ উঠল। লীগ পরিষদ দলের জনাব তর্কবাগীশ বলে উঠলেন, "আমাদের ছাত্রগণ যখন শাহাদাত বরণ করছেন তখন আমরা আরামে পাখার হাওয়া খেতে থাকব তা আমি বরদাশত করব না।" এ বিলেই তিনি পরিষদ কক্ষ বর্জন করে এসে ছাত্রদের মাইকে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে ও আন্দোলনের সপক্ষে বক্তৃতা করলেন।

রাত্রে পুর্ব হতে জারীকৃত সান্ধ্য আইন আর ১৪৪ ধারার বিন্দু মাত্র চিহ্নও কোথাও রইল না। শহর আর শহরতলীর হাজার হাজার মেয়ে-পু রুষ সেই রাত্রে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের প্রাঙ্গণ দেখতে আসে। দেখে মনে হল যারা শহী হলো তারা যেন মৃত্যুহীন, তারা যেন বাংলার সকল ধর্মের সকল মতের মানুষের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছে এই বধ্য ভুমিকে।

২২শে ফেব্রুয়ারী :

এই দিন ভোর থেকেই সলিমুল্লাহ হল, মেডিক্যাল কলেজ, ফজলুল হক হল, মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল, জগন্নাথ কলেজের মাইকগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সকল কর্মী আর ছাত্রদের আন্দোলনেরর সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের জন্য আহ্বান জানান হয়।

সকাল বেলা সংবাদপত্রে দেখা গেল মাত্র ৩ জন নিহত, ৩০০ জন আহত ও ১৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শহরের সমস্ত দেকান পাট, গাড়ী ঘোড়া, অফিস আদালত, যান বাহন বন্ধ করে শ্রমিক মজুর কেরানী ও কর্মচারীরা স্বত:স্ফুর্ত ভাবে ধর্মঘটে এগিয়ে এসছে। শহীদদের লাশগুলিকে চক্রান্ত করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ভেতর 'গায়েবী জানাজা' পড়া হলো। এদিন সমস্ত শহর মিলিটারীর হাতে দেয়া হয়েছে। তবুও দেখতে দেখতে অসংখ্য মানুষ জানাজায় এসে শরিক হলেন। ইমাম সাহেব মোনাজাত করলেন, " হে আল্লাহ আমাদের অতি প্রিয় শহীদানের আত্মা যেন চির শান্তি পায়। আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার দেওয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে।"

জানাজা শেষে জনসাধারণকে নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ওলি আহাদ পরিস্থিতির সামগ্রিক গু রুত্ব বিচার ও কর্মপন্থা ঘোষণা করে বক্তৃতা করলেন। তার মুখ থেকে এক একটি কথা যেন আগুনের ফুলকির মত বে রুল। সভা শেষে লক্ষাধিক জনতার মিছিল বেরোয়। এই শোভা যাত্রার মধ্যখানে হঠাৎ লাঠি চার্জ করার পরও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে না পেরে গুলী চালায়। এখানেই হাইকের্টেও কেরানী সফিউর রহমান শহীদ হন। ছত্রভঙ্গ জনতা তখন হাইকোর্ট আর কার্জন হল চত্বরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। .. ..

অন্যদিকে সকাল ৯ টায় জনসাধারণের এক বিরাট অংশ 'মর্নি নিউজ' অফিস জ্বালিয়ে দেয় এবং 'সংবাদ' অফিসের দিকে যেতে থাকে। সংবাদ অফিসের সম্মুখে মিছিলের উপর মিলিটারী বেপরোয়া গুলী চালায়। অনেকেই হতাহত হয় এখানে।

এই দিন জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ শহরের বিভিন্ন অঞ্চল দলবদ্ধ হয়ে শোভাযাত্রা বের করে, আর ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। .. .. প্রায় ১১ টা পর্যন্ত রেল চলাচল একদম বন্ধ থাকে। সবদিক থেকে ব্যপকতম ধর্মঘটের চাপে সরকার সেদিন বিকল হয়ে পড়েছিল। তারই চাপে পড়ে সেদিন পরিষদে লীগ সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন গুলী চালানার প্রতিবাদে লীগ পার্লমেন্টারী দল বর্জন করেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ঃ

গত দুই দিন ধরে পুলিশ-মিলিটারী নিরস্ত্র জনতার উঁপর বেপরোয়া গুলী চালিয়েছে। শহীদদের লাশগুলি নিয়ে পর্যন্ত সরকার ছিনিমিনি খেলেছে। লাশগুলি কোথায় নিয়ে গেছে তার কোন হদিসিই মেলে নি। জনসাধারণের মধ্যে চুড়ান্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। .. ..

.. প্রদেশের সর্বত্র ঢাকার হত্যাকাণ্ডের প্রাতবাদে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সংগঠিত বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে । .. .. সরকার ব্যপক ধরপাকড় শু রু করেছে জেলায় জেলায়।

ঢাকায় পুর্ণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়েছে এদিনও। নিরস্ত্র জনতার উপর নাজিরা বাজার ও রেল ষ্টেশনেলাঠিচার্জ করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের মাইকটি মিলিটারী এসে জোরপুর্বক দখল করে নিয়ে যায়।

মেডিক্যাল হোস্টেলের গেটের পার্শ্বেই ছাত্ররা নিজেরাই শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ গড়ে তোলে। শহীদ সফিউর রহমানের পিতা স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করেন। এইদিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদকে আন্দোলন চালানোর জন্য পুর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। সভায় ৯ দফা দাবী স্থিরীকৃত হয় এবং নু রুল আমিনের জঘন্য মিথ্যা বিবৃতির প্রতিবাদে পাল্টা বিবৃতি দেওয়া হয় আর প্রদেশের ও কেন্দ্রের আন্দোলনে যোগসাধনের জন্য কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। .. ..

২৪শে ফেব্রুয়ারী ঃ

যতই সরকার দমন নীতি চালাচ্ছি ল ততই জনসাধারণ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সংগঠিত হচ্ছিল। একটানা ৪ দিন তুমুল আন্দোলন চলেছে ঢাকা শহরে। .. .. প্রত্যেকটি মুহুর্তে সরকারের পতনের আশঙ্কা ছিলো। এমনি পরিস্থিতি দেখে গভর্ণর অনন্যোপায় হয়ে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আইন পরিয়দের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপর গুলী চালানোর জন্য তীব্র নিন্দা করেন এবং তারই প্রতিবাদে ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মিলিটারী বাহিনী ফজলুল হক হল, জগন্নাথ কলেজ, মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও সলিমুল্লাহ হলের মাইকগুলি জোরপুর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সলিমুল্লাহ হলের পশ্চিম দিকস্থ দরজা ভেঙ্গে মিলিটারী প্রায় ৮০ জনের মত কর্মীকে গেফতার করে এবং সলিমুল্লাহ হলের ভিতরে আন্দোলনকারীদের যে সেক্রেটারিয়েট বসেছিল তার সমস্ত কাগজপত্র হস্তগত করে নেয়। সন্ধ্যাবেলা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের স্মৃতি স্তম্ভটি মিলিটারী এসে ভেঙ্গে ফেলে।

জটিলতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ আবার সভা আহ্বান করে। সরকারকে ৭৫ ঘন্টার চরমপত্র দেয়া হয় এবং ৫ই মার্চ প্রদেশব্যাপী "শহীদ দিবস" পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়; আর আন্দোলনে সর্বমোট ৩৯ জন শহীদ হয়েছেন বলে দাবী করা হয়। ৯ দফা দাবীর ভিত্তিতে সরকারের নিকট নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন নিয়োগ দাবী করা হয়।

২৫শে ফেব্রুয়ারী ঃ

আন্দোলনের চাপে পড়ে কর্তৃপক্ষ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন এড়াং ছাত্র ছাত্রীদের হল পরিত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে নির্দেশ দেন। তখন আন্দোলনের সমস্ত প্রচার যন্ত্র সরকার কেড়ে নিয়েছে। .. .. আন্দোলনের মুল

৯ জন কর্মকর্তার উপর গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়ে গেল। সরকার যথেচ্ছা গ্রেফতার শুরু করল ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের । সংবাদপত্রগুলিও সুর বদলিয়ে আন্দোলনকারীদের রাষ্ট্রের শত্র□ বলে আখ্যা দিতে লাগল। শহরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। ফলে আন্দোলন স্বাভাবিক ভাবেই আপাততঃ স্তব্ধ হয়ে গেল।

২৭শে ফে ব্রুয়ারী ঃ

রাত্রে পুলিশ এক বাড়ীতে হানা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোরণের ৯ জন আত্মগোপনকারী নেতার মধ্যে ৮ জনকে গেফতার করে নেয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারি যে, ৫ই মার্চ ঢাকা শহরে শহীদ দিবস সফল হয় নি। অসংখ্য মিলিটারী সারা শহরের অলি গলি বেষ্টন করে রেখেছিল। তবে মফস্বলে ৫ই মার্চ শহীদ দিবস পুর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সরকার জনগণের দাবীকে অস্বীকার করতে না পেরে এক ভুয়া তদন্ত কমিশন বসান। আন্দোলনের নেতাদের কারাগারে রেখে কেবল সরকারী লোক দিয়েই কমিশন গঠিত হওয়ায় সর্বদলীয় কর্মপরিষদ এই কমিশনকে প্রত্যাখান করে। নুরুল আমীন সরকারের চরম দমন নীতির ফলে ও নির্যাতনের চাপে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন আপাতত স্তব্ধ হয়ে গেলেও, পুর্ব বাংলার মানুষকে আন্দোলন বিমুখ করে তোলা যায় নি শত অত্যাচারের মুখেও। এর প্রমাণ পরের বছর ১৯৫৩ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক সাফল্য- সারা দেশের মানুষ ঐ দিন শান্তিপুর্ণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে বাহান্ন'র হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে সক্রিয়ভাবে আবারও রাস্তায় নেমে এসেছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পুর্ব বাংলার জনসাধারণ তাদের শত্র□গোষ্ঠীর চেহারা চিনে নিয়েছে। আর অমর বীর শহীদরা প্রত্যেকটি মানুষের মনে এক একটি স্মৃতি স্তম্ভ হয়ে রয়েছে চিরকালের জন্য। এই স্মৃতি স্তম্ভই সকল প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর ধ্বংস করে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এ দেশের মানুষের মনে দুর্জয় প্রেরণার সঞ্চার করে চলেছে।

বাহান্নর ভাষা আন্দোলন বাংলাভাষী মুসলমানকে বাংলার আবহমান গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনার ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি'কে ভালবাসতে এবং - নিজের বলে ভাবতে শিখিয়েছে। এক কথায় তাঁরা মধ্য প্রাচ্যের অলীক স্বপ্নময় জগৎ থেকে স্বগৃহাভিমুখী হয়েছে। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তযুদ্ধ আমাদের বহুত্ববাদী সেক্যুলার উদার গণতান্ত্রিক মুল্যবোধে উজ্জীবীত করে বলতে শিখিয়েছে ঃ

আমি মুসলিম নই
আমি হিন্দু নই
আমি বৌদ্ধ নই
আমি খ্রীস্টান নই

আমি বাঙালী, আমি মানুষ

অন্য দিকে কুপমণ্ডুক ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের চিৎকার "আমরা হব তালেবান- বাংলা হবে আফগানিস্তান"। এই, মৌলবাদী শক্তি আজ রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার- ধিক আমাদের, ধিক তাদের যাদের সাশ্রয়ে প্রশ্রয়ে এই

ক্ষমতারোহন- বেগম খালেদা জিয়া ও বি.এন.পি নেতৃত্বকে শত ধিক। মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে আমাদের জিততে হবে, এই হোক এবারের একুশের অঙ্গীকার আমাদের সকলের।*

* ২০০৫ সালের ২১ শে ফেব্রু□য়ারীকে সামনে রেখে মুক্তমনা'র জন্য বিশেষ লেখা